আমাদের সময়

05 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ড. মো. শরিফ উদ্দিন

সৃজনশীল শিক্ষার সাতসতের

যে কোনো জাতির জন্যই শিক্ষার প্রাথমিক স্তর অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বিগত দুই দশকে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বড় অর্জন রয়েছে। বিশেষ করে মেয়ে ও পশ্চাৎপদ শিক্ষার্থীদের জন্য। ইতোমধ্যে ১৬.৪ মিলিয়ন শিশু (বয়স ছয় থেকে দশ বছর) দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত। শিশুদের বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির হার ২০০৯ সালে শতকরা ৯০ ভাগ হলেও ছিটকে পড়ার হার অনেক বেশি। বিগত পাঁচ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেছে শতকরা ৫০.৭ ভাগ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপকরণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাতের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় ১৯৯০ সালে ৬০:১, ২০০৫ সালে ৫৮:১, ২০০৯ সালে ৪৯:১। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাতের সমতা থাকলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়নি। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যেমন– শিক্ষার মান কমছে, সৃজনশীল পদ্ধতির কার্যকারিতা শুরুতেই ফলপ্রসূ না হওয়া, শিক্ষা উপকরণের অপর্যাপ্ততা প্রভৃতি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে।

মহান এক লক্ষ্য নিয়ে সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়। এ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীলতা, জ্ঞান ও বুদ্ধির চর্চা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, দূরদর্শিতা, উপস্থিত বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি ক্ষমতা বাড়ানোকে লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়। বিষয়টি সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা মুখস্থনির্ভর শিক্ষায় নিরুৎসাহিত হয়। তারা নিজেরাই বইটি পড়ার চেষ্টা করে। প্রশ্নের উত্তর নিয়ে নিজেরা আলোচনা করে। নিজেরা মাথা খাটায়। জ্ঞানগত, আবেগিক এবং মনোপেশিজ– এই তিনটি বিষয়েই শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা যায় সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে। আর জ্ঞানগতভাবে একজন শিক্ষার্থীর উচ্চতর চিন্তা ক্ষমতা যাচাই করার সুযোগ থাকে। এতে শিক্ষার্থীদের জানার ক্ষমতা বাড়ে। শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন প্রবর্তিত সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে দ্বিমত নেই। সমস্যা হলো এর প্রায়োগিক পদ্ধতি নিয়ে।

শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন। প্রথমত, এই শিক্ষকরাই এখনো সৃজনশীল পদ্ধতি পুরোপুরি বুঝতে সমর্থ হননি। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের দুর্বলতা নয়, বরং তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে। সম্প্রতি রিসার্চ ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব কমপ্লিট এডুকেশন (রেস) প্রাথমিকে সৃজনশীল পদ্ধতির প্রয়োগের ওপর একটি গবেষণার জরিপ প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাথমিক সমাপনীতে সৃজনশীল চালু হওয়ার পর থেকে ৯২ ভাগ শিক্ষার্থী সরাসরি গাইড বইয়ের সহায়তা নেয়। মাত্র ৮ ভাগ শিক্ষার্থী গাইড বই থেকে দূরে থাকে। ৬৭ ভাগ সৃজনশীল বোঝার ক্ষেত্রে শিক্ষকের সহায়তা নিচ্ছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা গৃহশিক্ষক ও কোচিংনির্ভর। পরীক্ষার কেন্দ্রে ২৫ ভাগ শিক্ষার্থী প্রশ্নপত্র বুঝতে পারে না। এ পদ্ধতিতে ৩ ভাগ শিক্ষার্থী বাংলাকে, ৩৯ ভাগ ইংরেজিকে কঠিন বিষয় হিসেবে মনে করে। ৩৩ ভাগ মনে করে গণিত সবচেয়ে কঠিন বিষয়। আর ২৫.৬৫ ভাগ গণিত ও ইংরেজি উভয় বিষয়কেই কঠিন মনে করে। শিক্ষকদের নিয়ে চালানো জরিপে দেখা যায়, সৃজনশীল চালু ৮ বছর পার হলেও এখনো ১৩ ভাগ শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝেন না। আর ৪৫ ভাগ বোঝেন, ৪২ ভাগ শিক্ষক সীমিত পরিসরে বুঝলেও ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বোঝাতে পারেন না। অন্যদিকে সৃজনশীল না বোঝার কারণে ৪৭ ভাগ শিক্ষক বাজারের গাইড বইয়ের ওপর নির্ভর করেন, ৩৫ ভাগ সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং ১৮ ভাগ শিক্ষক নিজস্ব ধ্যান-ধারণা থেকে পড়ান। ২৫ ভাগ শিক্ষক মনে করেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা সঠিক হয়নি, আর ২০ ভাগ মনে করেন প্রচলিত পদ্ধতি আরও উন্নত করতে হবে। তবে ৫৫ ভাগ মনে করেন এ পদ্ধতি কিছুটা কাজ করছে।

তাহলে পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে না। উল্টো ফল দাঁড়াচ্ছে। শিক্ষকদের ভালোভাবে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ না দিয়েই এ পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। গ্রাম ও মফস্বল এলাকার স্বল্পশিক্ষিত মানুষ এ ফল নিয়ে তুষ্টি প্রকাশ করছে। সামাজিক অনুষ্ঠানে নিজের সন্তানের কৃতিত্ব ফলাও করে প্রচার করছে। বাস্তবিক শিক্ষার গুণগত মানের বারোটা এর মাধ্যমেই বাজছে। যেটা বলছিলাম, শিক্ষকরা যথাযথ প্রশিক্ষণ পাননি। ফলে অজ্ঞতা নিয়েই তারা পড়াচ্ছেন। শিক্ষার্থীদের মতো তারাও গাইড বইয়ের সহায়তা নিচ্ছেন। শিক্ষকরাই পদ্ধতিটাকে সঠিকভাবে আত্মস্থ করতে পারেননি। ফলে সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে একটা বড় রকমের সমস্যা তৈরি করছে।

আগের শিক্ষাব্যবস্থায় মোটামুটি শিক্ষার্থীদের বড় অংশ গাইড বইয়ের সহায়তা নিতেন। এখন ৯২ ভাগ শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ গাইড বই নির্ভরতার পাশাপাশি শিক্ষকদের গাইড নির্ভরতাও বেড়েছে। এটি মারাত্মক আতঙ্কের বিষয়।

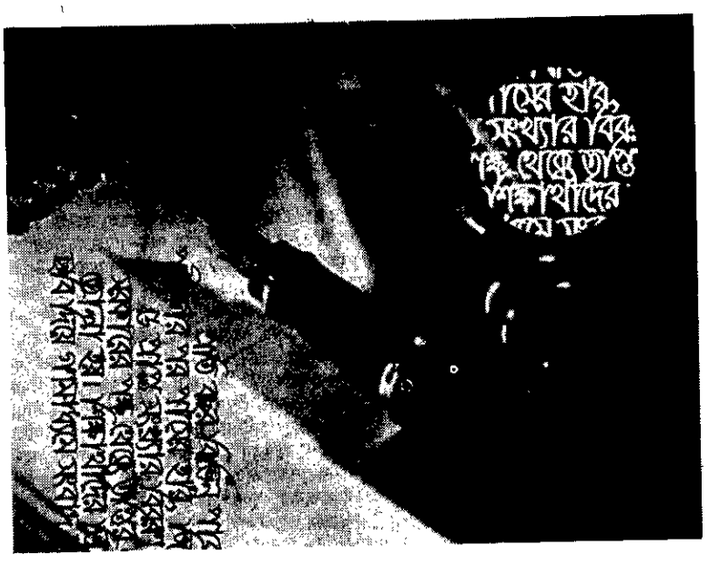

উদ্যোগ গ্রহণ করা বাস্তবসম্মত নয়। কিছু সরকারি সংস্থা থেকে দাবি করা হয়, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। গবেষণার জরিপে সে হিসাবটিও উঠে এসেছে। শতকরা হিসেবে, প্রতি শতাংশে মাত্র চার শতাংশ শিক্ষক এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ছিল তাও প্রধানত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, এই পদ্ধতিতে দশমিকে নম্বর দেওয়া হয় না। অর্থাৎ হলে ১ না হলে শূন্য! কিন্তু শূন্য এবং একের মাঝখানে .২৫ আছে .৫০ আছে, .৭৫ আছে। নম্বরের দশমিক এই শতাংশগুলো উপেক্ষা করা হয়। এতে ঢালাওভাবে শিক্ষার্থীদের নম্বর বেড়ে যায়। পরীক্ষায় পাসের হার বাড়ে। কথিত জিপিএ ৫-এর সংখ্যাও বেড়ে যায় বহুগুণে। বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি হয়। পাসের হার ঘোড়ার গতিতে বাড়িয়ে চলছে, প্রাথমিকেও শিক্ষার্থীরা গোল্ডেন জিপিএ ৫ পাচ্ছে, দেশব্যাপী উৎসবমুখর সৃজনশীল পদ্ধতির কারণে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গাইড বইয়ের প্রতি নির্ভরশীলতা তৈরি হওয়ায় তারা মূল পাঠ্যপুস্তক পড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এর ফলে তাদের জ্ঞানার্জন অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। এ পদ্ধতিতে আবার শিক্ষকদের একটি অংশ 'কমিশন ভোগী' হয়ে উঠছেন। বিভিন্ন অঞ্চলভেদে এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকাশনার গাইড বই ব্যবহার করা হচ্ছে। শিক্ষকদের একটি অংশকে প্রকাশনা হাউসগুলো কমিশন দিয়ে তাদের বই কিনতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। এমনকি সৃজনশীল যারা প্রণয়ন করেছেন তাদেরই কেউ কেউ গাইড বইয়ের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। শিক্ষকরা ক্লাসে সে বইগুলোরই রেফারেন্স দেন। প্রশ্ন করেন, ক্লাসে আলোচনা করেন সেই গাইড বই থেকেই। এতে শিক্ষার্থীদেরও 'সহজ' হয় পড়তে। তারা কেবল ওই গাইড বইয়ের অনুশীলনগুলোই মুখস্থ করে। পরিশ্রমও কম। এতে সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে।

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বইয়ের আধিক্য অস্বাভাবিক। এখনকার শিক্ষার্থীদের যে চাপে রাখা হয় তাতে কেউ-ই সৃজনশীল হতে পারবে না। যদি কোচিংয়েই যেতে হয় তাহলে স্কুলের দরকার কী? বইয়ের আধিক্য শিক্ষার্থীদের মাঝে ভীতির সঞ্চার করেছে। ফলে তারা আনন্দ তো দূরের কথা স্বাভাবিক অবস্থায়ও থাকতে পারে না। ভালো শিক্ষা না হলে ভালো কিছু আশা করা যায় না। জাতীয় পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাক্রম কার্যক্রম বোর্ড (এনসিটিবি) শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে দেয়। সমস্যা হলো, স্কুলগুলোতে এ তালিকা মানা হয় না। যত আধুনিক স্কুল, সে স্কুলের ক্লাসে বইয়ের সংখ্যা তত বেশি। নার্সারিতে পড়ুয়া একটি শিশুকে পড়তে হয় ছয়টিরও বেশি বই। এটি শিশুদের ওপর আশঙ্কাজনকভাবে মানসিক চাপ তৈরি করে। আরেকটি বিষয়, ঘন ঘন পরীক্ষা পদ্ধতি। আজ যে বিষয়ে পড়ানো হলো অথবা জ্ঞান জোর করে শিক্ষার্থীকে গিলে খাওয়ানো হলো, পরের দিন সে বিষয়েই পরীক্ষা। অর্থাৎ গলাধঃকরণ জ্ঞান উগড়ে দেওয়া। সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বার্ষিক– বিভিন্ন নামে পরীক্ষার এই আধিক্য শিশুর মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এতে তার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

প্রতি বছর বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার পর পাসের হার, জিপিএ ৫ প্রাপ্ত সংখ্যার বিবরণ তুলে সরকারের পক্ষ থেকে তৃপ্তির ঢেকুর তোলা হয়। শিক্ষার্থীদের ভি চিহ্ন ছবি দিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ করা হয়। এতে আত্মতুষ্টির কিছু নেই। স্বাধীনতার চার দশক পরে এসেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পদ্ধতি নিয়ে আমরা দ্বিধায় ভুগি। এ প্রবণতা দেশকে পেছনে টেনে ধরার জন্য মুখ্য উপকরণ হিসেবে যথেষ্ট। শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের নিজস্ব প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ে প্রাধান্য দিতে হবে। সৃজনশীল পদ্ধতি সফল করতে হলে কেবল পাসের হার আর জিপিও ৫ বৃদ্ধি নয়, এর সফল প্রয়োগের কার্যকরী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ, প্রশ্নপত্র তুলনামূলক সহজতর করা, ডিজিটাল উপকরণ যেমন প্রজেক্টর, কম্পিউটার, ইন্টারনেটসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, সমুদ্র উপকূলীয় ও পাহাড়ি অঞ্চল, বিচ্ছিন্ন জনপদ, সীমান্ত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার মতো বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। রাজনৈতিক স্বার্থ নয়, নয় গলার জোর বৃদ্ধি, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এতে অন্তত প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু আদর্শ নাগরিক পাওয়া যাবে। যারা দেশকে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষ ও সুযোগ্য নেতৃত্ব দেবে। দেশ এতে এগিয়ে যাবে সন্দেহ নেই।

লেখক : প্রেসিডেন্ট, রিসার্চ ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব কমপ্লিট এডুকেশন (রেস)
msharifju@yahoo.com